ভালোবাসা এখন ভার্চুয়াল—এটা কি সত্য সম্পর্ক?

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রেম-ভালোবাসা শব্দ দুটো জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের সঙ্গে। ভালোবাসা-প্রেম, এখনো প্রকৃতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও রহস্যময় আবেগ। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষই পরিপূর্ণ নয়। আজও মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল হলো ভালোবাসা। মানুষ এই ভালোবাসার জন্যই বেঁচে থাকার শক্তি পায় আবার ভালোবাসা শূন্য হলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ভালোবাসার মানুষের জন্য বেদনা আর রক্তের অক্ষরে লেখা হতো চিঠি। রাত জেগে পরচোখের আড়ালে হৃদয় নিংড়ানো শব্দ ঝাঁপি খুলতো সন্তর্পণে। তারপর সেই চিঠি কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল আরেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রা।ভালোবাসার সম্পর্কে যা একে অপরের মধ্যকার সমুদ্র সমান দূরত্ব আর পর্বত সমান বাধাকে জয় করে জন্ম দিতো আত্মার এক বন্ধনের।আত্মার এ মিলন জন্ম জন্মান্তরের।এর বিনাশ নেই,হতে পারে না! আর তাই যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্ম হয় ভালোবাসার। ভালোবাসার মৃত্যু নেই,তার রয়েছে শুধু বিকাশ। ভালোবাসা সত্যিই অমর। সত্যিকারের ভালোবাসাই যে পৃথিবীতে সবচাইতে মূল্যবান, তা প্রমাণিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে।

ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস ও রাজা মেনেলাউসের স্ত্রী হেলেনের প্রেম কাহিনি পৃথিবীতে স্বরণীয় হয়ে থাকবে।ইতিহাসে মিশরীয় ফারাও ক্লিওপেট্রা আর মার্ক অ্যান্থনির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাদের করুন প্রেম কাহিনি। দিল্লির প্রভাবশালী দম্পতি বাদশাহ শাহজাহান ও তার রানি মমতাজ। ভালোবাসার কাহিনী কারও অজানা নয়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বসত করে।স্বর্গীয় প্রেম নামে আখ্যায়িত লাইলি-মজনুর প্রেম কাহিনী। তাদের সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় ছিলো যে, মজনুকে আঘাত করলে আহত হতেন লাইলি নিজেই।প্রেমের জন্য এমন কত আত্মদানের নজির, সাহিত্যে অনুষঙ্গ।

একটা সময় ছিল যখন প্রেম বলতেই ছিল অন্তঃপুরের বিষয়। কাউকে ভালোবাসি বলাটাও ছিল পাপ। ‘হৃদয়ের কথা বলতে চাওয়ার ব্যাকুল’মন দহনে দহনে অঙ্গার হতো। বুক ফাটলেও মুখ ফুটতো না। জীবন প্রদীপ নিভে গেলেও প্রেম ছিল নিঃশেষিত।দেড় দশক আগেও প্রণয় এতোটা

দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারেনি। ভাঙতে পারেনি সামাজিকতার দেয়াল।

এখন সময় বদলে গেছে। পার্বতীর জন্য দেবদাসের দীর্ঘ অপেক্ষার যুগ শেষ হয়েছে । শিরি-ফরহাদের মতো অতৃপ্ত ভালোবাসার ইতিহাসও আর লেখা হবে না। প্রণয়-সঙ্গ এখন খুবই সহজ। চাইলেই প্রেম হয়! না চাইলেও হয়।আজকের যুগে ভালোবাসা এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাচেতনা, জীবনযাত্রা ও প্রযুক্তির বিকাশ ভালোবাসার ধরনও বদলে দিয়েছে।

আগেকার দিনে ভালোবাসা ছিল অপেক্ষা, চিঠির আদান-প্রদান, একে অপরের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যের পরীক্ষা। কিন্তু বর্তমান যুগের ভালোবাসা অনেকটাই গতিময়, প্রযুক্তিনির্ভর এবং বহুমাত্রিক।বর্তমান সময়ে প্রেম বা প্রণয় সম্পর্ক গড়া সহজ হলেও ভিত নড়বড়ে। বন্ধনও অতটা পোক্ত নয়। তাসের ঘরের মতো সম্পর্ক। এই আছে, এই নেই।আগে প্রিয় মানুষটির হৃদয়ের ধ্বনি তখন শোনা যেতো দূর থেকেও।বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ সেই দৃশ্যপট বদলে গেছে।বদলে গেছে প্রেমের মাধ্যমও। ফেসবুক,টুইটার,লিংকডইন,ম্যাসেঞ্জার,হোয়াটসআপ,ভাইবার,ইমো,স্নাপচ্যাট,জি-প্লাস,ইনস্ট্রাগ্রাম ইত্যাদি কত কিছু।এখন ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় ইনবক্সের বার্তায়, ইমোজির হাসিতে, কিংবা হঠাৎ আসা নোটিফিকেশনে। সম্পর্ক শুরু হয় এক ক্লিকেই, আবার শেষও হয়ে যায় আরেক ক্লিকে। প্রশ্ন জাগে—এমন ভার্চুয়াল ভালোবাসা কি সত্যিকারের সম্পর্কের সমান?ভার্চুয়াল এই প্রণয় জগৎ ঠুনকো করে দিচ্ছে আন্তরিক সম্পর্ক।চাকচিক্য প্রিয় মানুষ, সুন্দরের পুজারি মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে অন্তর্জালিক প্রতারণায়, যা বড় ধরনের বিপদও ডেকে আনছে সময়ে সময়ে।যোগাযোগ সহজ হওয়ায় মানুষের মনের টানও কমে আসছে।আগে প্রিয়তমা বা প্রিয়তমর দেখা পাওয়ার জন্য যে উত্তেজনা বা হৃদয়ের টান অনুভূত হতো মানবহৃদয়ে তা এখন নেই বললেই চলে।কারণ চাইলেই মুহূর্তে ভিডিও কলে রাখা যায় চোখে চোখ।

ভার্চুয়াল এই সাক্ষাতে কিছু ক্ষেত্রে প্রিয়জনকে কাছে টানা গেলেও আত্মিক বন্ধন নেই বললেই চলে।একটা উদাহরণ দিলে তা কিছুটা স্পষ্ট হবে।আমরা যখন কারও সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলি, তখন দুজনই দুজনের প্রতি মনোযোগী হই।তখন কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনায় তৃতীয় কেউ আসতে পারে না।কিন্তু আমরা যখন ম্যাসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলি, তখন একই সময়ে একাধিক জনের সঙ্গে আলাপ হয়।তখন আর মনোযোগ একমুখী থাকে না।একই সময়ে চিন্তাশক্তি এবং মনোযোগও ভাগ হয়ে যায়।এতে আলাপের গুরুত্বও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসে ।কারও কারও জীবনে

এই ভার্চুয়াল প্রেমই পরিণত হয়েছে স্থায়ী দাম্পত্যে। তাই প্রযুক্তি যেমন দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি ভালোবাসার নতুন এক অধ্যায় তৈরি করেছে।কিন্তু এই ভালোবাসার ভেতরেই লুকিয়ে আছে ভঙ্গুরতা। বাস্তবে দেখা না হওয়ায় অনেক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে কেবল কল্পনার ওপর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাজানো হাসি, এডিট করা ছবি আর অল্প কিছু কথোপকথন দিয়েই তৈরি হয় এক পৃথিবী। অথচ বাস্তবে সেই পৃথিবী হয়তো একেবারেই আলাদা। তাই সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতেই সম্পর্ক ভেঙে যায়, এক নিমিষে হয়ে যায় ব্লক কিংবা আনফ্রেন্ড।এই ধরনের ভার্চুয়াল সম্পর্ক খুব বেশি দৃঢ় হয় না।দীর্ঘদিন একসঙ্গে পথচলাও সম্ভব হয় না.তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ভার্চুয়াল ভালোবাসাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পড়াশোনা, পরিবার কিংবা নিজের ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সম্পর্ক। আবার এমনও আছে যারা কেবল সময় কাটানোর জন্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, আর অন্যজন ডুবে যায় মানসিক আঘাতে।

তাহলে কি ভার্চুয়াল ভালোবাসা মিথ্যে? আসলে ভালোবাসা মিথ্যে হয় না কখনো। মিথ্যে হয় মানুষ, যদি সেখানে না থাকে সততা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। ভালোবাসা যদি আন্তরিক হয়, তবে সেটা ভার্চুয়াল হোক বা বাস্তব—দুই জায়গাতেই সমান সত্য। শুধু ইমোজি পাঠালেই সম্পর্ক টেকে না; আবার দেখা না করেও হৃদয়ের গভীর টান তৈরি হতে পারে, যদি দুইজন মানুষ সত্যিই একে অপরকে গুরুত্ব দেয়।

আজকের এই ডিজিটাল যুগে ভালোবাসা হয়তো অনেকটাই ভার্চুয়াল হয়ে গেছে—এটাই সময়ের নিয়ম। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা আমাদের সবার জন্য রয়ে গেল—আমরা কি সত্যিই ভালোবাসছি, নাকি কেবল স্ক্রিনের আলোয় তৈরি করছি এক ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা?

লেখক: কবি ও উদ্যোক্তা।

আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ

গর্জন শুনেছিলাম—গো অন, চার্জ

‘রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলছিলেন- এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —।’

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ দৈনিক বাংলায় এক স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে সে রাতের অনেক কথাই উঠে এসেছে। এসব কথা ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য। নতুন প্রজন্ম এ থেকে জানতে পারবে ৩২ নম্বরে সে রাতে কি ঘটেছিল। দৈনিক বাংলা সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম দিয়েছিল ‘প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না: বেগম মুজিব’। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

“গত বছরের এই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে প্রথমেই আমার মন কেঁদে ওঠে। সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের কালো রাত থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পযর্ন্ত এ দেশের পরিজন-হারা লাখো লাখো পরিবারের কথা ভেবে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তাই পৃথক করে হিংস্র ঐ রাতের কোন কথা বলতে বা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না। বললেন শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব। কথা বলছিলাম ৩২ নং রোডের সেই। একটা বছর আগের একরাশ স্মৃতির ছায়ায় বসে বেগম মুজিব বলছিলেন অবিস্মরণীয় সেই ২৫শে মার্চের রাত ও তারও আগেকার দিনগুলোর কথা।

অসহযোগ আন্দোলনের সেই অনন্য দিনগুলো। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাংলার মানুষ এক হয়ে গেছে। ঠিক এমনি মুহুর্তে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকা বাংলায় এলো। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী নৃশংস এই পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আলোচনা বৈঠকের প্রথম থেকেই এক অশুভ কালো ছায়াকে আমি যেনো দেখতে পেয়েছিলাম সেদিনের জাগ্রত বাংলার অঙ্গনে। শেখ সাহেবকেও আমি বলেছিলাম যারা তাঁকে আগরতলা মামলায় জড়িয়েছে, তারা ভালোভাবেই জানে যে শেখ সাহেব

বাংলাদেশ আর বাঙালীদের চিন্তা-ভাবনাই করেন- পাকিস্তান প্রশ্নে তার আগ্রই নেই। পাকিস্তানের ক্ষমতা তারা শেখ সাহেবকে দেবে না। কাজেই আলোচনা আরম্ভ করে তারা অন্য কোন নতুন কৌশল বের করার সুযোগ খুঁজছে মাত্র। আমার কথা শেখ সাহেব শুনলেন। মুখে কিছুই বললেন না। তিনি দলীয় নেতাদের বৈঠক ছাড়া বাইরে তেমন কিছু বলতেন না তখন।

গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ির অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নীচে নেমে এলাম। শেখ সাহেব তখনো আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁকে ভেতরে ডেকে মিলিটারি বোঝাই গাড়ী সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত। সেই অশুভ রাত। রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি। বাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তার মুখে শুধু এক কথা-আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তার কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটাসহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহুর্তে কি ভেবে যেনো ছোট মেয়েটা আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন-বিপদে কাঁদতে নেই মা।

তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২ নং রোডের এই বাড়ীতে। বলছিল-বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি-না কোথাও আমি যাব না।

রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন-এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —-

সেই সাথে সাথেই শুরু তলে অঝোরে গোলাবর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম – সৈন্যরা এবার আমার বাড়ীতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে, মুসলধারে গোলাবর্ষন হতে থাকলো এই বাড়ীটা লক্ষ্য করে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলাবর্ষণ করে হত্যা করতে ছেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলাবর্ষিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়ীটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখচোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরন্ত মুহুর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্বাস্যভাবে পায়চারী করছিলেন শেখ সাহেব। তাঁকে ঐভাবে রেগে যেতে কখনও আর দেখিনি।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব, ওদের কিছু বলেননি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সেই সময়ই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো যদি না কর্ণেল দু’হাত দিয়ে তাঁকে আড়াল করতো । ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলি থামাবার জন্য । তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই নেমে গেলেন তিনি নীচের তলায়। মাত্র কয়েক মুহুর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজ ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো সুটকেস আর বেডিংটা তুলে নিল সৈন্যরা যাবার মুহুতে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে । পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে। সোফার নীচ থেকে, খাটের নীচ থেকে, আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দল কর্মী। রো আস্তে আস্তে বললো- মাগো আমরা আছি। আমরা আছি। ওদের সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে সে রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন—খোদার কাছে হাজার শোকর তোদের অন্তত: ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্তত ধরা পড়িসনি। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাত্রের কথা।”

সংকলক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-৪

পর্ব-৩ এর পর থেকে

তিনি বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সেই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-একবার স্বপ্নে দেখলেন, একটি মনোরম বাগানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সাথে অহরহ শিশু খেলা করছে আনন্দ করছে এবং সে মানুষ টি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং সেই শিশুগুলো ছিল দুনিয়াতে যারা শৈশবে ইন্তেকাল করেছে এবং তিনি শিশুদের এতটা ভালোবাসতেন দেখে জান্নাতে সেই শিশুরা তার সাথী হবে এবং অনাবিল আনন্দে তার সাথে সময় কাটাবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বয়স তখন আনুমানিক ৮৫ মা সারাহ’র ও বয়স হয়েছে অনেক মা হওয়ার বয়স নিঃসন্দেহে পার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন হাজেরা তখনও যুবতী এবং তার পক্ষে মা হওয়া সম্ভব ছিল। তার স্বামীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকে মা সারাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন তিনি যেন হাজেরাকে বিয়ে করে ফেলেন। একজন পুরুষের জন্য কখনোই বোঝা সম্ভব না একজন স্ত্রী নিজ থেকে এমন একটি প্রস্তাব দিতে হলে তাকে কতটা নিঃস্বার্থ হতে হবে কতটা বিসর্জন দিতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম অবশেষে তার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং মা হাজেরাকে বিয়ে করলেন এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতে কিছুদিনের মাথায় মা হাজেরা গর্ভবতী হলেন এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করলেন। একের পর এক ফিৎনার জীবনে এত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এত প্রতীক্ষার পর ৮৬ বছর বয়সে বাবা হওয়ার পর তার সন্তানের প্রতি তার স্নেহ কতটা প্রগার ছিল তা বর্ণনার উর্ধ্বে। কিন্তু মা সারাহ তার স্বামীর জন্য এতটা বিসর্জন দেওয়ার পর তার জন্য এসব কিছু আর নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি ইতিমধ্যেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের খুশির জন্য যা করেছেন তা হয়তো কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার স্বামীর দ্বিতীয় সংসারের আনন্দের নীরব প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকা তার জন্য সম্ভব ছিল না।

তিনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন তুমি হাজেরা আর ইসমাইলকে অন্য কোথাও গিয়ে রেখে আসো। প্রিয়তমা স্ত্রীর এই অনুরোধ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কিন্তু যার সাথে জীবনের এতটা পথ একসাথে পাড়ি দেয়া, যার বিসর্জনের কারণেই তার

বাবা হওয়ার এত বছরের ইচ্ছা পূরণ হওয়া, সেই জীবনসঙ্গীর কথা তিনি উপেক্ষা করেন কি করে। তিনি হাজেরা এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আল্লাহর ওয়াহী অনুযায়ী পাড়ি দেন বহুদূর পথ। তিনি তার গন্তব্য স¤পর্কে অবগত ছিলেন না জীবনের সব পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও ইব্রাহিম আলাইহিসালাম পুরোপুরি ভরসা রাখলেন আল্লাহর উপর। আল্লাহ তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে পথ দেখিয়ে দিলেন এক ধুধু মরুভূমির মাঝখানে। সেই জনমানবহীন অঞ্চলের নাম তখন ছিল বাক্কাহ যা পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচিত হয়। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তিনি মা হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে কর্কশ সেই মরুভূমির মাঝে রেখে কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে লাগলেন। পুরুষের প্রকৃতি হল সে সব সময় তার পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাদের নিরাপদে রাখার জন্য সে ব্যক্তিগত ভাবে সকল প্রকার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।

সেই জায়গায় তার প্রকৃতির ঠিক বিপরীতে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার স্ত্রী ও সন্তানকে এক অচীন মরুভূমির মাঝখান দিয়ে স্বেচ্ছায় রেখে আসা যে কত বড় পরীক্ষা ছিল, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাকে ফিরে যেতে দেখে মা হাজেরা বললেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমাদের কিভাবে রেখে যাচ্ছেন কেন? গভীর শোকে হোক বা আল্লাহর আদেশক্রমেই হোক ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে কোন উত্তর দিতে পারলেন না। মা হাজেরার উপলব্ধি হলো আল্লাহর ওয়াহী ছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কখনই এমনটা করার কথা না। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাওয়ার আদেশ করেছেন, এবার ইব্রাহিম আলাইহিসালাম উত্তরে বললেন হ্যা, ব্যাস এতটুকুই তাদের দুজনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আশপাশে পানি নেই, কোন প্রকার আশ্রয় নেই, কিন্তু এটা আল্লাহর আদেশ ছিল এতটুকু জেনেই মা হাজেরা তার এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবেই মেনে নিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অল্প কিছু রেখে যাওয়া খাবার দাবার ফুরিয়ে যেতেই ক্ষুদার্ত তৃষ্ণার্ত ইসমাইল কান্না আরম্ভ করল। মা হাজেরা দুই পহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন যদি কোন আশ্রয় পাওয়া যায়, যদি কোন পানীর সন্ধান পাওয়া যায়। সাফা আর মারওয়া পাহাড়ে সাতবার তিনি এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুটলেন একটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। কোন মানুষের সন্ধান পাওয়া না গেলেও সাধারণ কোন মানুষের চেয়েও অনেক

মর্যাদাবান কাউকে আল্লাহ মা হাজেরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, স্বয়ং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার সামনে দেখা দিলেন এবং তিনি তার পায়ে গোড়ালি দিয়ে মাটিতে এমন ভাবে আঘাত করলেন যে সেখান থেকে অঝোরে পানি বের হতে লাগল এবং এমন ভাবে পানি বের হতে লাগল যেন গোটা উপত্যকায় পানি দিয়ে ভরে যাবে। মা হাজেরা তখন জম জম থাম থাম বলে মাটি উঁচু করে সেখানে কুয়োর মত বানিয়ে দিলেন এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সেই অলৌকিক জমজমের পানি খাই। তিনি যেভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার তাকদীর মেনে নিয়েছেন আমাদেরকেও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমাদের তাকদীর মেনে নিতে হবে।

আমরা যে যেই সামাজিক অবস্থাতে জন্ম নেই না কেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যারা আর্থিক সংকটে জন্ম নেন তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জ একরকম, যারা যুদ্ধের মাঝে জন্ম নেন তাদের চ্যানেলগুলো আরেকরকম, মা হাজেরার মতো আমরা যদি আমাদের পরিস্থিতি মেনে নেই এবং আল্লাহর উপর ভরসা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু শুধু তাই নয় প্রতিবছর পবিত্র হজ্জে মানুষ মা হাজেরার মতো সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে সাতবার সায়ী করে বা ছুটে চলে, নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকলেই হবে না আমাদেরকে নিজ উদ্যোগে সমাধান খুজতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে কোন পথ কোন উপায় না থাকলেও সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে বাধা অতিক্রম করার জন্য। আমরা যদি আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তাহলে অলৌকিক ভাবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আলোর পথ পেরিয়ে আসবে।

ঠিক যেমন মা হাজেরার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম এসেছিলেন, তবে তিনি সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে ছুটে চলার পর তার আগে নয়। অলৌকিক জমজমের পানি দেখা দেয়ার পর সে অঞ্চলে পাখিরা ঘোরাফেরা করা শুরু করলো। কিছুদিন পর বনু জুরহুম গোত্রের এক ব্যবসায়ী কাফেলা সেখান দিয়ে ভ্রমণ করছিল। ধুধু মরুভূমির মাঝখানে এত পাখির আনাগোনা দেখে তারা সেদিকে কৌতুহল নিয়ে এগিয়ে গেল। মা হাজেরাকে সেখানে দেখে বুঝতে পারলো তার উপরে নিশ্চয়ই আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। তারা জমজমের পানি খাওয়ার জন্য তার কাছে অনুমতি চাইল এবং তার অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলো। মা হাজেরা একটি শর্ত প্রদান করলেন, যে তাদেরকে সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে হবে এবং তারা সে শর্ত মেনে নিল। জমজমের কুয়া কে ঘিরে একটি নতুন জনবসতি গড়ে উঠলো যেখান থেকে প্রাচীন আদনানী আরব জাতির শুরু এবং যে গোষ্ঠী থেকেই পরবর্তীতে কুরাইশ বংশের উৎপত্তি। ইসমাইল আলাইহিস সালাম বনু জুরহুম গোত্রের

লোকদের সাথে আনন্দে বেড়ে উঠতে লাগল এবং তারাও ছোট্ট ইসমাইলকে অত্যন্ত ভালোবাসতো।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাঝে মাঝে তাদের দেখতে আসতেন, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর জীবন মানেই যেন একের পর এক পরীক্ষা। জীবনের এই পর্যায়ে এসে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং বারংবার এই স্বপ্ন দেখার ফলে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। একটা পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তা আসলে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি একটি আদেশ। তিনি তার আদরের সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে স্বপ্নটা দেখলেন, তাই তার সাথেই শেয়ার করলেন। তিনি ইসমাইলকে ডেকে বললেন বাবা আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে কুরবানী করছি। তোমার কি মনে হয় এর মানে কি? ছোট্ট ইসমাইল আলাইহিস সালাম তার বাবাকে বললেন, হে আমার আদরের বাবা আল্লাহ যা হুকুম করেছে আপনি তাই করুন ইনশাআল্লাহ আমি সবর করব।

নিজের সন্তানের কাছ থেকে এমন উত্তর পেয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মনের অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জন্য বোঝা অসম্ভব। একদিকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখে নিজের সন্তান এতটা দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে নিশ্চয়ই গর্বে বুকটা ভরে গিয়েছিল। সেইসাথে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন এখন আর পিছু হটার সুযোগ নেই এখন সময় এসেছে আল্লাহর হুকুম পালনের সন্তানকে কোরবানি করার। নিজের মনকে শক্ত করে ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম তাঁর প্রিয় সন্তানকে নিয়ে হেঁটে চললেন তাকে কোরবানি করার জন্য। এরকম নাজুক মুহূর্তে শয়তান এসে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সামনে হাজির হয় মানুষের রূপ নিয়ে তার মনে সন্দেহ তৈরি করার চেষ্টা করে, ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তখন শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর মারেন তিনবার শয়তান তার সামনে হাজির হয় তিনবার তিনি তাকে পাথর মেরে সরিয়ে দেন। অবশেষে ইসমাইল আলাইহিস সালাম মাথা নিচু করে কোরবানি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজ সন্তানকে কোরবানি দেওয়ার জন্য ছুরি তুলে ধরেন এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহর ওয়াহী নাযিল হয়, আল্লাহর হুকুমে শেষ মুহূর্তে ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়। বাবা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম ঘরে ফেরেন আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মা সারাহ (আ.) কাছে ফিরে গেলেন এবং স্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

একদিন তার বাসায় কিছু মেহমান আসলো, তিনজন অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি তার দরজায় এসে টোকা দিল, ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাদের

চিনতে পারলেন না। কিন্তু তার মন এতটাই উদার ছিল যে তিনি তাদের সালাম দিয়ে হাসিমুখে ঘরের ভেতর আমন্ত্রণ করে নিলেন, ভাবলেন হয়তো তারা মুসাফির একটু বিশ্রামের জন্য তার ঘরে এসেছে, তাই তিনি তাদের ভেতরে বসিয়ে খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঘরে কি কোন খাবার আছে মা সারাহ বললেন এই যে অল্প কিছু মাংস আছে। ইব্রাহিম আলাইহিসালাম এর লজ্জা হলো মেহমানদেরকে আগের রয়ে যাওয়া মাংস পরিবেশন করতে।

পুরোপুরি অজানা এ মেহমানদেরকে খেদমত করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর একটি গরু জবেহ করবেন। একটা গরু এখন যেমন দামী তখনও তেমনি দামী ছিল, পার্থক্য এতটুকুই বর্তমান সময়ে একটা মাঝারি সাইজের গরু ৪০ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয় তখন হয়তো স্বর্ণের বিনিময়ে কেনা হতো। কিন্তু অপরিচিত মেহমানের জন্য একটা গরু জবাই দিয়ে তাদের খেদমত করা হবে। এমন উদারতার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এবং হয়তো তারই আশ্চর্য মেহমানদারীর জন্য ইব্রাহিম আলাইহিসালাম কে লোকেরা আবু দইফান বলে ডাকতেন যার অর্থ মেহমানদের পিতা বা আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করলে মেহমানদারীর গুরু।

(চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক,মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-৩

পর্ব-২ এর পর থেকে

অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো তাকে একটি বড় আকারের ক্যাটাপল ব্যবহার করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ক্যাটাপলের সাথে বাধা হলো তিনি তার সবটুকু ভরসা রাখলেন আল্লাহর উপর। এবং দোয়া করে বললেন: আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, তিনিইতো শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

বৃষ্টির ফেরেশতা ভাবতে লাগল তখন আমার কাছে বৃষ্টি নিয়ে নেমে

যাওয়ার হুকুম আসবে। আর কখন আমি এই আগুনটাকে নিভিয়ে দেব। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। সেই মুহূর্তের ভেতরেই তিনি আগুন কে হুকুম করে বললেন: আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। আর ইব্রাহিমের জন্য নিরাপদ হয়ে যাও এবং মুহূর্তের ভেতরেই আগুন তার রবের হুকুম পালন করে ঠান্ডা হয়ে গেল। এবং সে ছিল এক প্রশান্তিময় ঠান্ডা এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ যদি আগুনকে শুধু অর্থাৎ ঠান্ডা হতে বলতেন তাহলে আগুন তার রবের হুকুম পালনের তাগিদে এমনভাবে ঠান্ডা হতো যে তাতে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম আঘাত পেতেন। কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতিশীল যে তিনি আগুনকে হুকুম করার সময় যোগ করলেন অসালামা এবং নিরাপদ শান্তিময় হয়ে যাও।

য়ার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম ছিলেন সেখানে পুরোপুরি নিরাপদ। সবাই যখন আগুনের দিকে চেয়ে ছিল হয়তো ভাবছিল তাদের সমাজের ছেলেটা বখে যাওয়ার পর কি এক পরিণতি হলো। যখন ভাবছিল এই আগুন নিভে গেলে হয়তো ইব্রাহিমের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই ভাবনাগুলো ভেঙে দিয়ে অশরীরীর নেয় পাহাড়ের মতো উঁচু দাও দাও করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে হেঁটে হেঁটে পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সেই ঘটনার পর থেকে কেউ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ¯পর্শ করার সাহস পেত না। সবার থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে এবং তারই অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পরল।

সে সময় ব্যাবিলনের রাজার নাম ছিল নামরুদ। সে ছিল এক কঠোর স্বৈরাচারী শাসক। যার দাম্ভিকতা এতটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করত। যখন তার কানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগুন থেকে জীবিত বের হয়ে আসার ঘটনা পৌঁছাল সে তাকে ডেকে পাঠালো। ইব্রাহিম আলাইহিসালাম রাষ্ট্রপর্যায় তৌহিদের বাণী প্রচার করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। নমরুদ ইব্রাহিম কে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার উপাসনা কর? আজ পর্যন্ত যত মানুষকেই এই প্রশ্ন করেছিল সবাই একই উত্তর দিয়েছিল আপনি আমাদের প্রভূ হে নমরুদ। কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার রব তিনি যিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। নমরুদ এতটাই উদ্ধত মানসিকতা ধারণ করলো যে সে বললো আমি তো জীবন দেই এবং মৃত্যু দান করি।

এবং এরপর সে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি কে মুক্ত করে দিল এবং একজন নিরীহ ব্যক্তি কে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দিলো এবং এর মাধ্যমে বোঝাতে চাইল জীবন এবং মৃত্যু তারই হাতে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন নমরুদ এতটাই মাথামোটা যে সে তার এই বিচারহীনতাকে জন্ম এবং মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা হিসেবে মনে করছে। তিনি তার রবের

আর একটি বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, আমার রবের হুকুমেই সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় হয় আর পশ্চিম দিক থেকে অস্ত যায়। তুমি কি এর বিপরীত করে দেখাতে পারবে। নমরুদ আসলেই নিজেকে সত্যিকার অর্থেই প্রভু ভাবত। সে কথা দিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হারাতে চাচ্ছিল না।

কারণ সেটা হলে সে সহজেই বলে দিতে পারতো আসলে সূর্য আমার হুকুমেই পূর্বদিক হতে উদয় হয়। পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু সে যেহেতু আসলেই নিজেকে প্রভু মনে করত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা শোনার পর প্রথমবার তার মাথায় এই ব্যাপারটা খেলা করলো আসলেই তো সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আমি তো কখনো এমনটা হওয়ার জন্য কখনো হুকুম করিনি। আর আমার হুকুমেতো এটা পরিবর্তন হবে না। তাহলে কার হুকুমে প্রতিনিয়ত এমনটা ঘটছে। (চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক,মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-২

পর্ব-১ এর পর থেকে

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন কিছু করার পরিকল্পনা করলেন, যা সমাজের মানুষকে তাদের গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। শহরের সবাই যখন চলে গেল উৎসবে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম গেলেন মন্দিরে। যেখানে তার বাবার নিজ হাতে তৈরি বহু মূর্তির অবস্থান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নানা আকৃতির, নানা ধরনের মূর্তি রাখা। সবার মাঝখানে রাখা ছিল সবচেয়ে বড় মূর্তিটি। যে কিনা ছিল তাদের প্রধান দেবতা। এরা যদি আসলেই মূর্তি না হয়ে দেবতা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমি আক্রমন করি তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এই বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বিরাট হাতুড়ি নিয়ে একে একে সব মূর্তি ভাঙতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই মূর্তিগুলো নিশ্চুপ। যার প্রাণ নেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে কী করে। একে একে সব মূর্তি ভেঙে তিনি প্রধান মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। একটি ঘর চারপাশে শত শত মূর্তির ভাঙা টুকরো মাঝখানে শুধু একটি প্রকান্ড মূর্তি তার গলায় ঝুলছে এক বিরাট হাতুড়ি। আর তার কিছুদূর সামনে

দাঁড়িয়ে আছেন একজন যুবক। নাম তার ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর হাত ধরেই পাল্টে যায় গোটা মানবজাতির ইতিহাস। শহরবাসীরা ফিরে এসে হতবাক। তাদের এমন সর্বনাশ কে করল। তারা যখন উৎসবে আনন্দ করছিল তখন কে এসে তাদের সব দেবতাদের এভাবে ধ্বংস করে দিল। একমাত্র আযারের ছেলে ইব্রাহিমই তো এলাকায় ছিল। বাকি সবাই তো তাদের সাথেই এই উৎসবে উপস্থিত ছিল। সবাই মিলে বলল ইব্রাহিমকে ডাকা হোক সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানে। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম কে সবার সামনে হাজির করা হলো। এবং জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা।

ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: আমি কি করে জানব, তোমরা বরং তোমাদের বড় দেবতাকে তাকে জিজ্ঞেস করো। হাতুরিটাতো ওর গলায় ঝুলছে। তার কথা শুনে শহরবাসীরা আরো রেগে গেল। এই মূর্তি কি করে বাকি মূর্তিদের ভাঙবে। যখন সে নিজেই নড়তে পারে না। যখন তার কোন প্রাণ নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: তোমরা নিজেরাই যখন জানো এই মূর্তিগুলো জীবিত নয়, তারা স্রেফ পাথর। তাহলে তাদের কেন অযথা প্রার্থনা কর। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এর এই প্রশ্নগুলো সমাজের মানুষদের এতটাই ভাবিয়ে তুললো, যে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়াতে বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলার যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাদের অনুভূতি গুলোকে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন তারা নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাল অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনে তারা আসলে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বলতে লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় করেছো।

কিন্তু এরপর আল্লাহ বললেন: এই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হল, এরপর তারা তাদের মাথার ওপর ঘুরে গেল এখানে মূলত আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে পরক্ষনেই তারা তাদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসলো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ান এইট্টি ড্রিগ্রি ট্রান নেওয়া। তারা তাদের প্রথা, তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস, পূর্বপুরুষদের রীতিকে প্রাধান্য দিল সত্যকে ঢেকে দিল এবং সবাই সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলে বললো, ইব্রাহিমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হোক। শহরের সবাই মিলে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে কাঠের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেলো। এরপর তারা সেখানে আগুন জালালো এবং সে আগুন এত প্রকান্ড আকার ধারন করলো যে তারা বুঝতেই পারছিলো না।

যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে কিভাবে।
(চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক ,মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব -১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম , খ্রীষ্ট , ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী -রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা -বিপত্তির সম্মুখীন হই , পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই। আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি , যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে , দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে , আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম -আয়েশে জীবন -যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা - বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত

আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম

আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন

অনন্তলোকে যাত্রাশিল্পী আক্কাস আলী

গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে একটি শাদা রঙের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন যাত্রানট আককাছ আলী। দেওয়ালে ঝুলছে রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের আবক্ষ প্রতিকৃতি। আককাছ আলী চক্ষু বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই ছবিগুলোর সামনে।

তার পায়ে ফিতে বাঁধা জুতা, ভেলভেটের ট্রাউজার্স, পুরো হাতা শাদা জামা, তার দু’ কবজির কাছে কুচি দেওয়া, মাথায় পরচুলা, কুঞ্চিত কেশ ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁচা-পাকা গোঁফ রং মাখিয়ে কুচকুচে কালো করা হয়েছে, মুখে জরির আভা, একেবারে পাক্কা সেনাপতি। কোমরবন্ধে তলোয়ার। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে দর্শকভর্তি প্যান্ডেলে আককাছ আলীকে আবার এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথম যৌবন থেকে বিভিন্ন মঞ্চে এমন কত পরীক্ষা যে তাকে দিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! কখনও স্কুল-কলেজের নাট্যমঞ্চে, কখনও যাত্রার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে। দেবী সুলতানায় কখনও আলীবর্দি, কখনও-বা হাজি মোল্লা সরাফ হয়ে মঞ্চে উঠেছেন। নাচমহলে দবির খাঁ, অশ্রু দিয়ে লেখায় মাসুদ খাঁ সেজেছেন।

সিরাজ উদ দৌলায় সেজেছেন কখনও মোহনলাল, কখনও ওয়াটস। আবার কখনও-বা সেনাপতি মীরজাফর হয়ে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে এক মঞ্চে একই সঙ্গে সিরাজ উদ দৌলা পালায় পার্ট

করেছেন। কোনো পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হননি। মঞ্চে উঠলে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠতেন তিনি। তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হয়ে উঠতেন রাজাধিরাজ । রঙ্গমঞ্চের সেই রাজাধিরাজ সব কাজ সারা করে গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই তারাভরা আকাশকে বিদায় জানিয়ে অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।

আককাছ আলি ছিলেন পেশাদার যাত্রা-অভিনেতা মানে প্রফেশনাল যাত্রাশিল্পী। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও যাত্রাশিল্পের সার্বিক সংকটের কারণে তিনি পেশাদারি মঞ্চ ছাড়েন নব্বই দশকের প্রারম্ভে। কিন্তু যাত্রা ছাড়েননি আমৃত্যু। দুঃখ-দারিদ্র্য, শোকতাপ, ঝড়বৃষ্টি কোনো কিছুই তাকে রঙ্গালয়-বিমুখ করতে পারেনি। কারণ তার যত আনন্দ, যত খ্যাতি-পরিচিতি সব-ই তো রঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে! সে জন্য রঙ্গালয়-ই ছিল তার প্রাণভোমরা– প্রিয়তম জায়গা। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী ছিলেন একাধারে সুঅভিনেতা, নির্দেশক, মঞ্চপরিকল্পক ও নাট্যসংগঠক। যাত্রা জগতে তার কদর ছিল; ছিল দারুণ সমাদর। তাই কখনও মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কখনও সাহারবাটী নবকল্লোল অপেরা, আবার কখনও গাংনী বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে অভিনয় করতে হত।

এমনকি চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার কোনো অখ্যাত, নামগোত্রহীন যাত্রাদল থেকে ডাক আসলেও সাড়া না দিয়ে পারতেন না। মেহেরপুর জেলার সৌখিন যাত্রাদলগুলিতে তার ছিল দারুণ কদর। আককাছ আলির জন্ম ১৯৫৪ সালে রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর গ্রামে। পিতা আতর আলি ছিলেন একজন কৃষক। তিনিও জারি গাইতেন, ভালবাসতেন যাত্রাপালা দেখতে। পড়ালেখার জন্য পুত্র আককাছ আলিকে তিনি বহরপুর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

১৯৭৩ সালে বহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। ভর্তি হন বালিয়াকান্দি কলেজে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনাগ্রহ ও গান-বাজনার প্রতি অত্যধিক ঝোঁকের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার পাট চুকে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের আগেই। প্রয়োজনের তাগিদে বাবার সঙ্গে ব্যবসা ও চাষবাসে লেগে যান। পাশাপাশি চলতে থাকে নাটক-থিয়েটার ও গানবাজনা।

১৯৭৬ সালে তিনি দেশপ্রিয় নাট্যসংস্থায় পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান করেন। তারপর যাত্রা ও অভিনয়মঞ্চ হয়ে ওঠে তার ধ্যানজ্ঞান। বিভিন্ন প্রফেশনাল অপেরা থেকে তার ডাক আসতে থাকে। বাড়তে থাকে কদর। এরপর আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাবুল অপেরা, মধুমতী

অপেরা, গীতাঞ্জলি অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, চৈতালী অপেরার মত স্বনামধন্য অপেরায় তিনি পেশাদার অভিনেতা হিসেবে মোটা মাইনেতে কাজ করতে থাকেন। কাজ করেন অতুলপ্রসাদ, রত্◌্◌েনশ্বর চক্রবর্তী, নলেশ গুহর মত খ্যাতিমান যাত্রানটদের সঙ্গে। আশীর্বাদ লাভ করেন যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের। গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে প্রফেশনাল যাত্রাদলগুলিতে আর্থিক ও ব্যবসায়িক মন্দা দেখা দিলে, সম্পৃক্ত হন সৌখিন দলে। অল্প সময়ের মধ্যে এলাকার বিশেষত গাংনী-মেহেরপুরের সৌখিন যাত্রাদলগুলির মধ্যমণি হয়ে ওঠেন।

১৯৮৬ সালে নিজগ্রাম বহরপুর ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে। শুরু হয় তার দ্বিতীয় জীবন। জীবিকার তাগিদে, কখনও-বা শখের বশে অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে যোগ দেন মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন নাট্যদলে। মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন যাত্রাদল ও নাট্য সংস্থায় অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে কাজ করে যশ-খ্যাতি ও ভালবাসাঅর্জন করেন বিপুল পরিমাণে।

এই অসামান্য অভিনেতা ছিলেন সব ধরনের চরিত্র রূপায়ণে সমান পারদর্শী। সামাজিক পালায় অভিনয়ে যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই ঐতিহাসিক পালাতে অভিনয় করেও আনন্দ অনুভব করতেন।‘অশ্রু দিয়ে লেখা’, কোহিনূর’, ‘আনারকলি’, ‘নাচমহল’, ‘মোঘল ই আযম’, ‘সিরাজ উদ দৌলা’, ‘শহীদ কারবালা’, ‘এজিদ বধ’, ‘দেবী সুলতানা’, ‘গলি থেকে রাজপথ’, ‘একটি পয়সা’, ‘নীচুতলার মানুষ’, ‘অনুসন্ধান’, ‘জানোয়ার’, ‘শেষ প্রদীপ’, ‘ক্ষুদিরামের ফাঁসি’, ‘কলঙ্কিনী বধূ’সহ প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছেন।

যাত্রাশিল্পে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ২০১৯ সালে তাকে গুণীশিল্পী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে। ‘যাত্রা-থিয়েটারের লোক’ হিসেবে আমৃত্যু তিনি যাত্রার সঙ্গে ছিলেন।‘যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন যাত্রা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেই থাকবেন’—- এ ছিল তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ছেদ হল যাত্রা তথা রঙ্গমঞ্চের সাথে।

ভোরের আলো ফোঁটার আগে প্রিয়জন-শুভানুধ্যায়ীদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। যাত্রাশিল্পী আক্কাসআলি ছিলেন মন্যুষত্ব, অসাম্প্রদায়িক-মানবিকতার অকুণ্ঠ অনুরাগী। ভালবাসতেন থিয়েটারকে, ভালবাসতেন মানুষ ও পৃথিবীকে। তাই যা কিছু মানবিক, তা-ই ছিল তার

কাছে সুন্দর। মানুষের সুখ-দুঃখ, পতন-উত্থান, রক্ত-অশ্রু– সবই সুন্দর। সুন্দরের সাধক এই মহৎ শিল্পীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

মোবাইল গেমসে ধ্বংস শিক্ষার্থী ও শিক্ষা

করোনা ভাইরাস প্রকোপের আগে থেকেই পাবজি ও ফ্রি ফায়ার গেমস নামক অনলাইন গেমসে তরুণ সমাজের আসক্তির বিষয়ে অধিক খবর প্রচার হতে দেখা গেছে।

করোনা ভাইরাসের কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় এই প্রকোপ আরও বেশি দেখা যাচ্ছে। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে বাড়িতেই অবস্থান করতে হচ্ছে এবং বাড়িতে অবস্থান করার শর্তে অনেক বাবা-মা’ই সন্তানের এমন গেমস খেলাকে মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু অজান্তেই সন্তানের পড়ালেখার আগ্রহকে একেবারেই নষ্ট করে দিচ্ছেন বাবা-মা নিজেরাই।

অতীতে বিভিন্ন ছুটিতে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন লেখকের লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, কবিতার বই ইত্যাদি পড়তে দেখা গেলেও এখন তা কালেভদ্রে দু’এক জনকে দেখা যায়।

বেশিরভাগ শিক্ষার্থী-ই এখন মোবাইলে তাদের অবসর সময় গুলো পার করছেন।

অনেক বাবা-মাকে দেখা যায় ছোট বাচ্চারা খাওয়া দাওয়া না করলে, মোবাইলে বা টিভিতে কার্টুন লাগিয়ে দেয়, এতে সন্তানের খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে পুষ্টি হলেও তার মস্তিষ্কের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে বাবা-মায়ের নজর একেবারেই নেই।

আগে বিকালে ছেলে-মেয়েরা ক্রিকেট, ফুটবল, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, গাদন খেলাসহ হরেক রকমের খেলা খেলতে দেখা যেতো,

কিন্তু আধুনিকতার স্পর্শে এখন এগুলো আর দেখা যায় না। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা তো এখন অনেক খেলার নাম-ই জানে না। কারণ তারা এখন মোবাইলে গেমসে আসক্ত, তাই শারীরিক কসরতের খেলাটা তাদেরকে খুব একটা আকর্ষণ করে না, ফলে শারীরিক ব্যায়ামের একটা ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

প্রযুক্তি আমাদের জন্য যেমন সুফল বয়ে এনেছে ঠিক তেমনি কুফলও বয়ে এনেছে, দরকার শুধু সঠিক ব্যবহারের। কিন্তু ব্যবহারের সব রকম সুযোগ যখন শিক্ষার্থীদের হাতে চলে আসে তখন তাদের অবচেতন মনেই তারা সেই সুযোগ ব্যবহার করে ভুল পথে পা বাড়ায় এবং ক্রমেই তার মূল্যবান সময়গুলো ফেসবুক, ইউটিউব, পাবজি, ফ্রি-ফায়ার ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে হেলায় নষ্ট করে ফেলে।

একটি সময় ছিল যখন সন্ধ্যার পর বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এরা সবাই বাচ্চাদের বিভিন্ন কেচ্ছা বা গল্প শোনাতো কিন্তু এখন বাবা-মায়ের সময় কই? শহরে তো বটেই এখন পল্লীগ্রামেও ভিনদেশী অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে। এখনকার মায়েরা সন্তানদের আর রাজা-রাণীর গল্প, ভূতের গল্প, রাক্ষস রাজার বা শেয়াল-কুমিরের গল্প শোনায় না। এ যুগের মায়েরা এখন সন্ধ্যার পর থেকেই ভিনদেশী টিভি সিরিয়াল দেখতে বসে পড়েন। এতে করে মা নিজের ক্ষতি তো করছেনই পাশাপাশি ক্ষতি করছেন নিজের সন্তানের।

এখন স্কুল মাঠে ছেলেরা আর ফুটবল ক্রিকেট খেলতে যায় না, এখন তারা মাঠে যায় ঠিকই কিন্তু ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে নয় মাঠের এক কোনায় বসে দলবেঁধে মোবাইলে গেমস খেলতে। আপনি হয়তো তাদের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন এবং তাদের গেমস খেলার বিষয়টি লক্ষ্য করছেন, কিন্তু তাতে কী? তারা কিন্তু আপনাকে মোটেও খেয়াল করছে না। ভাবটা এমন যে, যদি তাদের পাশে পারমাণবিক বোমাও নিক্ষেপ করা হয় তাতেও তাদের চৈতন্য হবে বলে মনে হয় না।

এ বিষয়ে কয়েকজন বাবা-মায়ের কাছে জানতে চাওয়া হলো যে, মাধ্যমিকে পড়া একটা ছাত্রকে তিনি কোন যুক্তিতে মোবাইল কিনে দিলেন? উত্তরটা ছিল চমকে যাওয়ার মতো। একজন বাবা বললেন, তার সন্তান তাকে বলেছে যে, এন্ড্রয়েড মোবাইল না কিনে দিলে ছেলে আত্মহত্যা করবেন! আর এই ভয়েই ভীত হয়ে বাবা তার ছেলেকে মোবাইল কিনে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আরেকজন মা বললেন, ছেলে মোবাইল কিনে না দেওয়ায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ

করে দিচ্ছিলেন এমনকি ২ দিন নাকি না খেয়েও ছিলেন ফলে ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য বাবা বাধ্য হলেন মোবাইল কিনে দিতে। আর আরেকজন মা তো শখ করেই তার ছেলেকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মেয়েদের খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে হয় না। তারা বাসায় রাখা তাদের মায়ের মোবাইলকেই নিজের মোবাইল বলে চালিয়ে নিতে পারে, কেননা মা মোবাইল সম্মন্ধে অতটা বিজ্ঞ নয়, তাই মেয়েরা হয় মায়ের সাথে টেলিভিশন দেখায় ব্যস্ত আর না হয় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত।

এতকিছুর মধ্যে পড়ালেখার সময়টা বের করাই এখনকার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ! কেননা তাদের পড়ালেখার সময় কই? এর কিছুটা দায়ভার অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও বর্তায়, সৃজনশীল নামক শিক্ষাব্যবস্থার যাতা কলে শিক্ষার্থীরা নিষ্পেষিত। যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রচলিত তার সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষকরাই এখনো ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি, তাহলে শিক্ষার্থীদের অবস্থাটা কি বুঝতে পারছেন? এখনকার পদ্ধতিটা হচ্ছে বিদ্যা গেলানো আর সেই গিলে ফেলা বিদ্যা পরীক্ষার হলে উগলানো। শিক্ষার্থী কিন্তু পড়ালেখাটা হজম করতে পারে না।
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার নতুবা মেকি শিক্ষিত শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে। একজন প্রকৃত মানবিক এবং খাঁটি শিক্ষার্থী কখনোই পাওয়া যাবে না।

সব শ্রেণির মাতৃকূল কিন্তু এমনটি নয়, কিছু বাবা-মা আছেন যারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আশাবাদী কেননা তারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাড়িতে কোনো টেলিভিশনই রাখেননি! শুধু তাই-ই নয় সন্তানতো নয়-ই মা নিজের কাছেও কোনো এন্ড্রয়েড ফোন রাখেননি অথচ চাইলেই তারা এরোকম শতশত মোবাইল কিনতে পারেন।

আচ্ছা ঐ যে বাবা তার ছেলের আত্মহত্যার ভয়ে বা মা তার সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য মোবাইল কিনে দিলেন তাদের সন্তান কি আদতে এখনো বেঁচে আছে বলে আপনাদের মনে হয়? অনেকেই ভাবতে পারেন ছেলের আবার মৃত্যু হলো কিভাবে? আসলে শারীরিক মৃত্যুবরণই মৃত্যু নয়, আরেক শ্রেণির মৃত্যু হলো আত্মার। আসলে ঐ সকল বাবা-মা তাদের সন্তানের আত্মার মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে এ থেকে বের হবার উপায় কী? উপায় আছে। আপনি আপনার যুগে ফিরে যান এবং নিজেকেই প্রশ্ন করুন উত্তর পেয়ে যাবেন। সন্তানকে নিজে বন্ধুর মতো সময় দিন উত্তম

বন্ধু হয়ে উঠুন তাহলে তার আর বাইরের বন্ধুর প্রয়োজন হবে না।

কেননা আজকের সন্তানদের বাবা-মা নামক উত্তম বন্ধুর খুবই অভাব। নিজের সন্তানের খোঁজ খবর রাখুন কোথায় যায়, কী করে কার সাথে মিশে এগুলো খোঁজ নিন। আর যতটুকু সম্ভব নিজে সময় দিন। প্রযুক্তিকে যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তার হাতে প্রযুক্তি দিতে পারেন তবে সেটা অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর।

কেননা এর আগের সময়গুলো আপনার সন্তানের ভিত্তি ঠিক করার সময় এই সময়গুলোকে হেলায় নষ্ট হতে দেবেন না। আর উচ্চ মাধ্যমিকের পরে আপনার সন্তান নিজেই ভালো মন্দের বিচার করতে শিখে যাবে।

গেমস নামক এই মরণ ব্যাধি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য এখনই সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং তা অত্যাবশকীয়।

বোকা বাক্সে বন্দী আমাদের ক্যাম্পাস জীবন

স্কুল শেষে একটি ভালো কলেজে ভর্তি হতে কে না চায়! অনেকে স্বপ্ন পূরণ করতে পারে,অনেকে পারে না। একারণেই
মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে একঝাঁক তরুণ তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক কলেজে। কেউ পেরেছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে আবার কেউবা পারেনি ।

আবার অনেকে ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হয়তো ভর্তি হতে পারে নি । ঠিক আমিও অনেক প্রতিকূলতার গণ্ডি পেরিয়ে আল্লাহর তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে একটি সুন্দর ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়েছি যা বাংলাদেশে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ নামে পরিচিত ।

প্রতি বছর জুন – জুলাই মাসে প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক যেমন নতুন

তরুণ-তরুণীদের কোলাহলে পূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি আমার কলেজেও কোলাহলপূর্ণ একটি অবস্থা বিরাজ করে । সেখানে যেমন সকল শিক্ষকদের সাথে নতুন পরিচিতি, সকল সহপাঠীর কাছে নতুন, ক্যাম্পাসের কাছে নতুন, ঠিক তেমনি নতুনদের সাথে মানিয়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা বা আগ্রহ সবার মধ্যে থাকতে দেখা যায় ।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ এ-এক নান্দনিক চিত্র । কিন্তু এই বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণে বিশ্ব যখন একটা সংকটময় সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন উচ্চমাধ্যমিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন । কিন্তু সব কিছু তো আর থেমে থাকলে চলে না । তারই ধারাবাহিকতায় একাদশ শ্রেণীর প্রাতিষ্ঠানিক সকল কার্যক্রম অনলাইনে “”এরিক ইয়ান”” এর তৈরি জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে চলতে থাকে ।

সেখানে প্রথমত,শিক্ষকদের সাথে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, ক্লাস টিচার সহ সকল শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি পর্ব, তারপর ক্লাস রুটিন প্রকাশ হওয়া এবং চূড়ান্ত ভাবে নিয়মিত রুটিনের মাধ্যমে ক্লাস শুরু । কিছুদিন পর ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেন শ্রেণি শিক্ষক । ছেলেদের মধ্যে আমি মেয়েদের মধ্যে অনন্যা সরকার নির্বাচিত হয় । ক্লাসের ৬৪ জন শিক্ষার্থী হয়তো ৬৪ জেলার, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবাই তাদের শিক্ষকের দেওয়া আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করে আবার কেউবা শিক্ষকের পাঠানো লিংক দিয়ে তখন ওই ৬৪ জেলার সকলেই ৬ ইঞ্চি ডিসপ্লের মধ্যে। যেন পৃথিবীটা যেন ছোট হতে হতে ড্রয়ারে রাখা বোকা বাক্সেতে বন্দী!

জুমে স্যাররা ক্লাস নেন, কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত অফলাইনের সেই জীবন্ত ক্লাসটি হয়তো শত চেষ্টার পর ও সেই জীবন্ত লাগে না। তবে অনেক শিক্ষক আবার সেই অনলাইন ক্লাসটিও গল্প আড্ডায়,জীবনবোধ দিয়ে জীবন্ত করে তোলেন। হয়তো তাদের কাঙ্ক্ষিত শাসনটি ও করতে পারেন না অনলাইনের এ-ই জটিল ধাঁধাঁয়। শিক্ষকরা তাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে দেখে যে শান্তি পান সেই তৃপ্তি হয়তো তারা আর পান না।চোখে হয়তো ঠিকই দেখেন ৬ ইঞ্চি ডিসপ্লেতে কিন্তু সেটাই কি চোখের শান্তি মেটানো দেখা । এ একটি যান্ত্রিক অবস্থা…

এবার নিতুন ক্যাম্পাস নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছে হয়। বাংলাদেশের অন্য সব কলেজ থেকে আমার কেলেজ একটু আলাদা, অন্যরকম। কারণ,
আমাদের ক্যাম্পাসের প্রতিটা কোনা যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে

শিক্ষার্থী দিয়ে, সেখানে হয়তো এখন একটা কাক পক্ষীও নেই । কেন নেই সেই প্রশ্ন হয়তো ক্যাম্পাস নিজেকেই নিজে করে । কিন্তু ক্যাম্পাস কি তার উত্তর দেয়??

ক্যাম্পাস এতক্ষণে কোলাহলপূর্ণ থাকতো ।
শিক্ষকরা ধারাবাহিক ভাবে ক্লাস নিতো , কুইজ ক্লাব ঘরে কুইজ হতো , চলত দেশ সেরা বিতর্ক ক্লাবের বিতর্ক, বিজ্ঞান ক্লাবের বিজ্ঞান চর্চা, আবৃত্তি ক্লাবের বিদ্রোহী কবিতা, আর কত কী! শিক্ষার্থীরা টিফিন টাইমে “”ডালিয়া “” ক্যান্টিনে ভিড় জমাতো । তারা তাদের ক্যাম্পাসের ২৪ টি ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন সহ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতো, সেখানে কেউ তাদের ভিতরে বিরাজমান প্রতিভা দেখিয়ে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি পেত,কেউ কলেজ লিডার হত, কেউবা হাউস লিডার। সব মিলিয়ে একটা উৎসবের আমেজ থাকতো ।

আমার কলেজে বিভিন্ন গ্যালারির মাধ্যমে শিক্ষণীয় সকল বিষয়কে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হয়েছে এবং যা ১০০% স্বার্থক । একেকটি গ্যালারি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা একবার একটি শিক্ষার্থী ঘুরে দেখলেই তার মনের ভিতরে ধারণ করতে পারবে এবং সেই বিষয় সম্পর্ক এ তার একটি সুনিশ্চিত ধারনা সে পেয়ে যাবে । আমাদের কলেজের গ্যালারি সমূহ একনজরে দেখে আসা যাক…

✓মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি
✓Health & Hygiene Gallery
✓Science Galaxy
✓আমার সোনার বাংলা গ্যালারি
✓শিল্পাঙ্গন গ্যালারি
✓লোকশিল্প ও কারুকাজ গ্যালারি ✓শিল্প সম্মৃদ্ধ বাংলাদেশ গ্যালারি ✓দুর্বার বাংলাদেশ গ্যালারি
✓স্বপ্ন সিড়ি
✓ সশস্ত্রবাহিনী গ্যালারি
✓জ্ঞান কুঞ্জ গ্যালারি
✓মানবিক ও বিজনেস গ্যালারি
✓স্পোর্টস গ্যালারি

আর নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্ণার।

এগুলোকে হয়তো এখন আর কেউ দেখে না । কিন্তু এগুলোর সাথে পরিচিত

হয়েছে অনেকেই । আরো সুদূর ভবিষ্যতে আরো অনেকে পরিচিত হবে ইনশা আল্লাহ। আর জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়বে জানার দারুণ ইচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা এই পরিস্থিতি কোন একদিন স্বাভাবিক করে দিবেন । । সর্বোপরি একটাই কামনা নিয়ে আমার এই লেখা শেষ করি আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেন । আর আমরা আমাদের প্রিয় সেই ক্যাম্পাসের সাথে বেড়ে উঠে যেন সৎ,পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, কর্মঠ ও মানুষের মত মানুষ হতে পারি।

কারণ আমাদের কলেজের উপরে বড় করে লেখা আছে
” ভালো মানুষ হও,সাফল্য তোমার পেছনে ছুটবে “.

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ থেকে ,
সেকশন-এলিথিয়া

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প এবং একটি পর্যালোচনা

পর্যটন এবং পর্যটক আমার খুব পছন্দের শব্দ। এই শব্দ দুইটা শুনলেই মনে পড়ে যায় নৈস্বর্গিক সুখের স্মৃতি গুলো। সেই শৈশব থেকে আমার ভ্রমণের প্রতি একটা অন্যরকম দুর্বলতা ও ভালোলাগা কাজ করতো। এখনো মনে পড়ে আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি তখন পরিবারের সাথে কক্সবাজার ঘুরতে গিয়েছিলাম। যার রেশ আমার ভিতর এখনো বিরাজমান।

আর এই ভালোবাসা ভালোলাগা থেকেই আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন ট্যুরিজমের সাথে সম্পৃক্ত হই যার কারণে বাংলাদেশের প্রায় সব গুলো দর্শনীয় স্থান এবং স্থাপনা আমি অবলোকন করেছি স্বচোখে। আর তখন এতোটা আগ্রহী ছিলাম যে যার কারণে ট্যুর অপারেশন অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ঞঙঅই) এর সদস্য হয়েও ট্যুরিজম নিয়ে কাজ করেছি।

ভ্রমণ মানুষের মনকে করে প্রসারিত ও উদার। ভ্রমণে আমি উপভোগ

করেছি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্যপূর্ণ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে জড়িত নান্দনিক স্থাপনা গুলো। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার যার ১২০ কিলোমিটারের ভিতর কোন কাদা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।

শৈবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, রামুর বৌদ্ধ মন্দির, হিমছড়ির ঝরণা, ইনানী সমুদ্র সৈকত, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপ, টাঙ্গুয়ার হাওড়, টেকনাফ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়ি অঞ্চল দেখে আত্মভোলা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

আবার ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্তিক স্থান বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, কুষ্টিয়ার লালন সাঁইয়ের মাজার, রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি।

বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি যা পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হিসেবে থাকার কথা এবং উপলব্ধি করেছি পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশর সম্ভাবনা কতটুকু। এবং সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছি দেশ থেকে যখন নিউইয়র্ক আসি। প্রায় ১২ বছর হয়ে গেছে তখন আমার এখানেও চাকুরী আর ব্যক্তিগত ভ্রমণ মিলে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশ ঘুরেছি এবং একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি আমাদের দেশের চেয়ে এখানে এত সংখ্যক পর্যটক কেনো আসে।

আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং সৌন্দর্য বহন করা একটা স্থপনার চেয়ে বহুগুণ সাদামাটা দর্শনীয় জায়গা ঘুরার জন্য আমাদের দেশের তুলনায় বেশি সংখ্যক লোক ভীড় করে প্রতিদিন। কিছুদিন আগে একটা জরিপ দেখলাম প্রতি বছর এক’শ কোটিরও ——–বেশি পর্যটক সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে। তাহলে কেন আর বেশি সংখ্যক পর্যটক বাংলাদেশে আসছে না? বাধা কোথায় ?

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত, ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, অনেক প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন, বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের বনাঞ্চল, উপত্যাকা, ঝর্ণা, নদী, পাহাড়ি ঝিরি নদীমাতৃক বাংলাদেশ। ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য ও নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশ পর্যটনের

জন্য সম্ভাবনাময়। কিন্তু এ সম্ভবনা কাজে লাগলো যাচ্ছে না কেন? ১৯৯৯ সালে বিশ্বে পর্যটন খাতকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এরপর দীর্ঘ ২০ বছর অতিবাহিত হলেও প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের মতো আমরা এ পর্যটন খাতের উন্নয়ন ঘটাতে পারিনি। নাহলে এ নিতান্ত ছোট দেশ মালদ্বীপের চেয়ে পর্যটনের আয়ে কেমন করে এত পেছনে পড়ে থাকে? প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে কয়েক মাইলের ছোট একটি দ্বীপ /মালদ্বীপ পর্যটন খাতে প্রতি বছর বাংলাদেশি টাকায় আয় করছে ২ হাজার কোটি টাকা আর বাংলাদেশে এ খাতে যে আয় হয়ে থাকে, তা নগণ্য।

বহুদিন ধরে আমার অভিজ্ঞতা এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বের হয়ে এলো দেশের পর্যটন স্পটগুলোতে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। অন্যদেশ গুলোর তুলনায় এবং তার ওপর এখন বিভিন্ন দেশে তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণে সতর্কতা দিয়ে রেখেছে। অবকাঠামোগত সমস্যার পাশাপাশি পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক প্রচার নেই । এখন আমার মনে হয় ‘যত্ন করলে রত্ন বাড়ে’ এই প্রবাদটা এখন আমাদের বোঝা উচিৎ খুব গুরুত্ব দিয়ে। কেননা কোনো শিল্পকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারক হিসেবে নিতে হলে তার বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার দরকার।

পরিকল্পিত ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মদ্যোগ গ্রহণ করা। এখন আমাদের করনীয় পর্যটকদের যাতায়াত, নিরাপত্তা, থাকা-খাওয়ার সুবিধাসহ সবকিছুর প্রতি নজর দেয়া। শহর, নগরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,দেশের সুস্থ আরামদায়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা করা। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকরা কিছুটা নিরুৎসাহিত হোন এগুলো দূর করা।

এছাড়া পর্যটন শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের জন্য মিডিয়া কর্মী যাঁরা আছেন তাঁদের আরো পজিটিভ হওয়া উচিত। সরকারি-বেসরকারি উভয়ের উদ্যোগের আন্তরিকতা বাড়ানো। বিভিন্ন পর্যটন স্পটে পর্যটকরা ছিনতাইসহ নানা রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, এগুলোর প্রতি নজর দেয়া এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের সহযোগিতা করা নিশ্চিত করতে হবে।

এসব ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে দেখভাল করা হচ্ছেনা বলে বিশাল সম্ভাবনা

থাকা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে আছি এবং এতোটা পিছিয়ে আছি যা রীতিমত প্রশ্নবিদ্ধ। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা। দেশীয় পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে প্রচার-প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে একটা পর্যটন বা দর্শনীয় স্থান তৈরী হওয়ার সাথে সাথে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়ে যায়। আর সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

এসব ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হবে বিশ্বের হাজার হাজার ভ্রমাণ পিপাসু মানুষ। ফলে দেশ এখাত থেকে অর্জন করতে পারবে বৈদিশিক অর্থ যা কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সূচককে।